প্রসঙ্গ গীতা ও স্বামীজী

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

গীতা চিরন্তন ধর্মগ্রন্থ, সমস্ত সম্প্রদায়গত ভাবনার ঊর্ধ্বে। কারণ কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দা বা কোনও বিশিষ্ট ভাবকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে এটি দাঁড়িয়ে নেই। অধ্যাত্মপথের চরম সত্য—যা সমস্ত ধর্মের পথিকদেরই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু—তা লাভের অতি উদার এক সামগ্রিক ভাবনার কথা এই গ্রন্থে বিধৃত। তার প্রমাণ, নিজ নিজ ভাব ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি রেখেও গীতার দেশনা গ্রহণে কোনও অসুবিধা নেই। সমগ্র মানবজাতির যে-মানবীয় ধর্ম ও তার থেকে উত্তরণের যে-আকাঙ্ক্ষা সব ধর্মেই লক্ষিত তা বিভিন্ন পথ ধরে হলেও তার মূলভাবগুলি ক্রমানুসারে এই ধর্মগ্রন্থে পরিবেশিত। এর উৎপত্তি এক অদ্ভুত পরিবেশে। এক মহা যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজারা যুদ্ধে জড়িত। অসংখ্য লোকক্ষয় যেখানে নিশ্চিত, সেরকম এক ভয়াবহ যুদ্ধপ্রাঙ্গণে আধ্যাত্মিকতার চরম সত্য উপদিষ্ট হচ্ছে ভীত, যুদ্ধবিমুখ, হৃতপৌরুষ এক যোদ্ধাকে। যুদ্ধ একটি হিংসাত্মক কর্মের প্রকাশ, তারও যে একটি আধ্যাত্মিক আশ্রয় হতে পারে এটি গীতার একটি অনন্য উপস্থাপনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘নিঃশ্বাস ফেলা এও কর্ম, সোঽহংবাদীদের আমিই সেই এই চিন্তাও কর্ম।’’ এই সোঽহং চিন্তা থেকে ভয়াবহ যুদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত কর্মই আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে করলে যে তা মানুষকে শ্রেয়ঃপথে অগ্রসর করিয়ে দেয় এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠার জন্যেই হয়তো এর উদ্ভব যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনেক ব্যক্তিই গীতার মধ্যে হিংসাত্মক যুদ্ধে প্ররোচিত করার দোষ দেখতে পান এবং সেকথা সোচ্চারে প্রকাশও করে থাকেন। রাশিয়াতে এটি সন্ত্রাস সৃষ্টির, হিংসাত্মক কর্মের উসকানিমূলক গ্রন্থ বলে তা নিষিদ্ধ করার জন্যে বিচারালয়ে বিচার চেয়েছিলেন কিছু মানুষ। বিচারকদের শুভবুদ্ধিতে তা নাকচ হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক এই দোষে গ্রন্থটি কতখানি দোষী। গীতা নিশ্চিতরূপেই অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্যই উপদিষ্ট। অহিংসা, অপ্রতিরোধ ও ক্ষমার তত্ত্বজ্ঞানের আড়ালে অর্জুনের ভীতি আশ্রয় নিয়েছিল। মনের এই কপটতা অর্জুন ধরতে পারেননি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ধরে ফেলেছিলেন। অহিংসা, অপ্রতিরোধ ইত্যাদির আড়ালে অক্ষমের আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা কপটাচরণ বলে মানবসমাজে স্বীকৃত। এ-গুণগুলির প্রতিরোধ

সক্ষম ব্যক্তিকেই মানায় ও তা তাকে অধ্যাত্মপথে এগিয়ে দেয়। কিন্তু এই সক্ষমতা লাভের জন্য কর্মের প্রয়োজন এবং তা একটা ভাবকে আশ্রয় করে। কারণ কর্মের পরিমাণ ও তীব্রতা কর্মের উদ্দেশ্য নিরূপণ করে না, বরং তার অন্তরালের ভাবটিই তা করে থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল দুটি কারণে। দুর্যোধনের ক্রূরতা, শঠতা, নীচতা, চরম পরশ্রীকাতরতা দেশের রাজা হিসেবে, রাজ্যের বাতাস বিষবাষ্পে ভরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাই তাকে পরাজিত করে দেশে শুভ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যেকোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজশক্তির পক্ষে রাজধর্ম হিসেবে অবশ্যকর্তব্য ছিল। দ্বিতীয়ত দুর্যোধনের ক্রূরতা ও নিরন্তর হত্যার ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচতে বাঁচতে পাণ্ডবদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ এবং হত্যা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরং নীতি হিসেবে কর্তব্য। উপরিউক্ত দুটি কারণের যেকোনও একটিই যুদ্ধের পক্ষে যথেষ্ট ও নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। অহিংসার একটি দুর্বলতম দিক—ধর্মের পথের বিঘ্নকে নির্মমভাবে উৎপাটিত না করে তার সঙ্গে আপোস করা। এটি অহিংসার নামে নিজের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরামবাবু মশা মারতে পারতেন না হিংসা হওয়ার ভয়ে, যদিও তাদের কামড়ে তাঁর ঈশ্বরচিন্তার ব্যাঘাত ঘটত। একদিন এ-বিষয়ে সংশয়াকুল মন নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখেন ঠাকুর বিছানা-বালিশ থেকে ছারপোকা নিধনে ব্যস্ত। বলরামকে দেখে বললেন, এরা ঈশ্বরচিন্তার ব্যাঘাত ঘটায়, তাই এদের নির্মূল করা দরকার। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত' বইতে জানাচ্ছেন যে ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অনাচারের ভয়ে খাজাঞ্চি দারোয়ান নিযুক্ত করেছিলেন যাতে ঠাকুর মন্দিরে ঢুকতে না পারেন; ঠাকুর বাধা পেয়ে সেই দারোয়ানকে এমন মুষ্ট্যাঘাত করেন যে সে যন্ত্রণায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ও চাকরি ছেড়ে দেশে চলে যায়।

স্বামীজী অহিংসা ও ধর্মের নামে তামসিকতার আশ্রয়ে ভারতীয়দের অধঃপতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ও তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাদের শিরায় শিরায় রজোগুণের সঞ্চার চেয়েছিলেন। উপনিষদের অভীঃ শব্দটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কম্বুকণ্ঠের তিরস্কার 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে' বাক্যটি স্বামীজী পরাজয়ের মনোভাবসম্পন্ন মানুষদের উজ্জীবনের মন্ত্র হিসেবে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন—বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ নয়, এখন গীতার সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালাতে হবে। বৃন্দাবনের অতি উচ্চভাব সাধারণের অনুপযুক্ত, অতি উচ্চাধিকারী না হলে এই ভাবে পতনের সমূহ সম্ভাবনা। এক হাতে ঘোড়াদের রাশ টেনে ধরে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহের মতন গর্জনে অর্জুনকে বলছেন—মুখে জ্ঞানীর মতো কথা বলছ অথচ তোমার আচরণ তার ঠিক বিপরীত। জ্ঞানীরা এই পরিস্থিতি কীভাবে দেখেন তুমি কি জান? এই প্রবহমান সংসারে নিত্য জন্মমৃত্যুর ধারায় তাঁরা বিচলিত হন না, শোক বা হর্ষপ্রকাশ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন, আত্মা সংস্কারযুক্ত বা সংস্কারমুক্ত যাই হোক তা মৃত্যুহীন। মানুষ যেমন বস্ত্র জীর্ণ হলে তা ফেলে দিয়ে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে ঠিক তেমনই জীবাত্মা দেহ জীর্ণ হলে তা ফেলে দিয়ে নূতন দেহ গ্রহণ করেন। তাদের কর্মই তাদের জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে যায়। কর্মের ভোগ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ জন্মমৃত্যুর আবর্তনে মানুষ ঘুরতে থাকে এবং কর্মানুযায়ী ফলভোগ করে। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম। এই ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে এক শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা যদি ভুলেও গিয়ে থাক তাহলেও জয়লাভ করে হয় এই পৃথিবী ভোগ করো অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে বীরের প্রাপ্য স্বর্গভোগ করো। অথবা তুমি যে-জ্ঞানের কথা

বলছিলে সেই জ্ঞানে যুক্ত হয়ে জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভকে সমদৃষ্টিতে দেখে যুদ্ধ করো কারণ কর্মের ফলে আসক্তিই মানুষের সুখ-দুঃখ-শোক-হর্ষের কারণ। যদিও কর্মের ওপর তোমার অধিকার আছে, নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু তার ফলের ওপর নেই, অতএব ফলের ওপর দৃষ্টি না দিয়ে, ফলে আসক্ত না হয়ে যুদ্ধ করো, তাহলে হত্যাজনিত যে-পাপের ভয় তুমি করছ তা তোমাকে স্পর্শ করবে না। এই বিচারবোধে যুক্ত হয়ে কামনাহীন কর্মে নিযুক্ত হওয়াই কর্মের কৌশল। এ-কৌশল যেমন তোমাকে আত্মজ্ঞানের অভিমুখী করবে তেমনই কর্মটিও অতি কুশলতার সঙ্গে সম্পন্ন হবে।

অর্জুন আমাদের সকলের প্রতিনিধি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমাদের যে-মনোভাব হয় তার প্রতিচ্ছবি তাঁর মধ্যে দেখি। তিনি আমাদেরই মতন স্বাভাবিক প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, যাঁরা আত্মজ্ঞানে স্থিত হন, তাঁদের ব্যবহার কেমন, অর্থাৎ তাঁদের লক্ষণ কী? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তাঁরা সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে আত্মাতেই স্থিত ও সন্তুষ্ট, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখও স্পৃহা করেন না; অনাসক্ত, ভয় ও ক্রোধহীন। সমুদ্র যেমন সমস্ত জলরাশি গ্রহণ করেও বিক্ষুব্ধ হয় না তেমনই জগতের ঘাত-প্রতিঘাত, হর্ষ-বিষাদ তাঁদের বিচলিত করতে পারে না, ফলে তাঁদের আত্যন্তিক শান্তি ভঙ্গ হয় না।

এরকম একটা আনন্দময় অবস্থা মানুষের পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব জেনে অর্জুন স্বাভাবিকভাবেই আবার প্রশ্ন করলেন—আত্মজ্ঞানের এই আনন্দময় পথে আমাকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার বদলে তুমি আমাকে এই ঘোর যুদ্ধে কেন নিয়োজিত করতে চাইছ তা বুঝতে পারছি না।

শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তরে যা বললেন তা সমগ্র জগতের অধিকাংশের মুক্তির পথ। বললেন—আত্মজ্ঞান বা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি একটি অবস্থা, যা কর্মের মধ্য দিয়েই লাভ করা সম্ভব, কর্ম ত্যাগ করে কখনই নয়। কর্ম না করে তুমি এক মুহূর্তও থাকতে পার না, এমনকী তোমার শরীরযাত্রাও নির্বাহ হয় না। যদিও কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা হয়েছে তবে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানেন সমস্ত কর্মের ফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সৃষ্টির সঙ্গে কর্মও সৃষ্ট হয়েছে এবং সে-কর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলেই তা যজ্ঞে পর্যবসিত হয়। এই কর্মরূপ যজ্ঞ দ্বারাই জগৎচক্র আবর্তিত হচ্ছে, এবং যে এই চক্রের অনুবর্তী না হয় তার জীবনধারণ বৃথা। তাই ফলে অনাসক্ত হয়ে কর্মরূপ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হলে ক্রমে চিত্তমালিন্য দূর হয়ে আত্মজ্ঞানে স্থিত হওয়া সম্ভব। একমাত্র তখনই সেই ব্যক্তির কোনও কর্ম থাকে না। তিনি তখন আত্মতৃপ্ত ও আত্মরতি হয়ে তাঁর শরীরী কর্ম ইন্দ্রিয়গুণের স্বভাববশে হচ্ছে জেনে তাতে লিপ্ত হন না।

স্বামীজী অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও দাসত্বের পাঁকে ডুবে যাওয়া মানুষকে উদ্ধারের পথ দেখেছিলেন এর মধ্যে। চাই গীতার এই শিক্ষা। স্বামীজী কর্মসন্ন্যাসের ফল দেখেছিলেন তৎকালীন সন্ন্যাসীদের অধিকাংশের মধ্যে—যা আলস্যের তামসিকতায় তাঁদের উদ্দেশ্যচ্যুত করে ভবঘুরেতে পরিণত করেছিল। এদিকে গৃহস্থাশ্রমে উচ্চবর্ণ ও ধনিসম্প্রদায় জগতের সমস্ত ভোগসুখ কুক্ষিগত করে রেখেছিল ও বিশাল জনসমাজকে তাদের ভাবনাচিন্তার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে তাদের মেরুদণ্ডহীন এক জীবন্ত শবের মিছিল করে তুলেছিল। এই ভয়াবহ অবস্থাকে সামাল দিতে স্বামীজী দায়িত্ব দিলেন সন্ন্যাসিসমাজকেই। কারণ স্বার্থপর, ভোগী, উচ্চবর্ণ ও ধনীদের কাছে এই ডুবে থাকা জনগণকে তুলে আনার আশা করা বাতুলতা। তাই যাঁরা জগৎসুখ ত্যাগ করেছেন—যাঁদের এই বিশাল জনসমাজ এতদিন পালন করেছে ও এখনও করছে, তাঁদের হাতেই এই দায়িত্ব সমর্পণের কথা

ভাবলেন তিনি। শংকরাচার্য জগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে সন্ন্যাসীদেরকে জগদ্‌বিমুখ করে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, একমাত্র সমাধিতেই জগৎ থাকে না এবং যতক্ষণ তা না হয়, জগৎ থেকে মন ও শরীরের পুষ্টি গ্রহণ করে তাকে অস্বীকার করলে কপটাচরণের ও পতনের সম্ভাবনা থাকে। বিদ্যামায়াকে আশ্রয় করে অধ্যাত্মপথে এগোলে এ-জগৎ আর ধোঁকার টাঁটি থাকে না, ক্রমে মজার কুটি হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বিভুরূপে সর্বত্র আছেন তাই মূর্তিতে তাঁর পূজা হয়, আর চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষে হবে না? 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্বভূতানি চাত্মনি' (৬।২৯)—নিজেকে সকলের মধ্যে ও সকলকে নিজের মধ্যে যিনি দেখবেন তিনি তো জগৎকে আত্মবৎই দেখবেন। আর যিনি দেখবেন শিবই জীবরূপে জগতে বিরাজ করছেন ('যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি,' ৬।৩০) তিনি সম্মুখস্থিত জীবরূপী শিবকে পূজা ছাড়া আর কী করতে পারেন! সাধ্যের আরোপই তো সাধকের সাধনার সোপান। তাই স্বামীজী নিষ্কাম কর্মের দার্শনিক শুষ্ক ভাবটিকে প্রেম ও ভালবাসার পূজায় পরিণত করে দিলেন। এটির উদ্দেশ্য দাঁড়াল দ্বিমুখী। প্রথম, মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে এই বিশাল জনসমাজকে জাগরিত করে তার মনুষ্যত্ববোধ ফিরিয়ে আনা এবং দ্বিতীয়, এ-পর্বটি শিববোধে মানবপূজার মাধ্যমে করে পূজকের আত্মজ্ঞান বা ইষ্টলাভের পথ উন্মোচিত করা।

বস্তুত স্বামীজীর সমগ্র জীবনটিই ছিল গীতার জ্বলন্ত ভাষ্য যা আমাদের গীতা বুঝতে সাহায্য করে। অর্জুনের সামনে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথের বাধাস্বরূপ আত্মীয়বধ ভিন্ন উপায় ছিল না, যেটি তাঁর ক্ষুদ্রস্বার্থ অপেক্ষা বহুগুণ বেশি জগৎকল্যাণে নিয়োজিত। স্বামীজীও একসময় এই সংসারের ক্ষুদ্রস্বার্থ তাঁর মা-ভাইদের পরিপালন অথবা বৃহত্তম স্বার্থ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদায়ী ধর্মের বাণী নিয়ে জগতকে ধর্মের পথে পরিচালন—এই দুই দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়েছেন। অর্জুনের সংশয়ে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার যেন পুনর্বার ঝংকৃত হল শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে। জগৎসুখ ও সমাধিসুখ তুচ্ছ করা সেই বহুশ্রুত তিরস্কার আজ জগৎকল্যাণকর্মের অন্যতম প্রেরণা। ঠাকুর বললেন, ''তীব্র বৈরাগ্য এলে ওসব হিসাব আসে না। বাড়ীর সব ঠিক করে তারপর ঈশ্বরচিন্তা করব এ ভাব থাকে না।'' নরেন্দ্রের সমাধিসুখের আশায় জল ঢেলে শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্রতর তিরস্কার বর্ষিত হল : ''ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, আর তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস?''

তিরস্কারবাক্যটি যেন স্বামীজীর মনে অর্জুনের সমর্পণের অনুরণন তুলল :

''নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥''
(১৮।৭৩)

জগদ্‌বাসীর দুঃখে রক্তাক্ত কোমল হৃদয় নিয়ে প্রবল বিক্রমে জগতের মুখোমুখি হলেন তিনি। তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ছিল পরাবিদ্যার সাক্ষাৎ অনুভব ও অপরাবিদ্যায় গগনচুম্বী ব্যুৎপত্তি। এ-ব্রহ্মাস্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন প্রোফেসর রাইট। তিনি দেখেছিলেন তাঁদের পাশ্চাত্যের সম্মিলিত অস্ত্রের শক্তিও এ-অস্ত্রের ধারে কাছে পৌঁছয় না, কারণ স্বামীজীর অপরাবিদ্যার পেছনে পরাবিদ্যার অনুভব কাজ করে। কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে নিরন্তর ডুবে থাকার জন্যে তাঁর যোগক্ষেম শ্রীরামকৃষ্ণকেই বহন করতে হত। প্রোফেসর রাইটকে লিখছেন স্বামীজী : ''কেউ এগিয়ে এসে আমাকে খেতে দেয়, হয়তো কেউ দেয় আশ্রয়, কেউ বলে—তাঁর কথা শোনাও আমাদের। আমি

জানি তিনিই তাদের পাঠিয়েছেন—আমি শুধু নির্দেশ পালন করে যাব। তিনি আমাকে সব যোগাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য বলেছিলেন, ''ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায় কাশীপুরে এক দর্শনলাভের পর শ্রীমাকে বলেছিলেন যে তিনি একদেশে গিয়েছিলেন যেখানের মানুষ সব সাদা সাদা। তখনই পাশ্চাত্যের ভাবজগতে তাঁর ভাবগ্রহণের অনুকূল বীজ পুঁতে রেখে এসেছিলেন তিনি। স্বামীজী নিশ্চিত বুঝেছিলেন, আমেরিকার ধর্মসম্মেলনটি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবদর্শনের বিকিরণমঞ্চ হিসেবেই প্রস্তুত হচ্ছে এবং সেখানে তাঁর যোগদান নিমিত্তরূপে। তাই পরবর্তী কালে তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে লিখেছেন (৪।১০।৯৫), ''সমাজ-ফমাজ যত দেখছ দেশ-বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—ময়ৈবৈতে ইত্যাদি... তাঁর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ডং গোস্পদায়তে।"

অর্জুন বিশাল নারায়ণী সেনার বদলে অস্ত্রহীন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে কৃতসংকল্প শ্রীকৃষ্ণকেই চেয়েছিলেন ও তাঁর উপর নির্ভর করেছিলেন। ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, কর্ণ এঁরা যে-কেউই তাঁর সমকক্ষ, কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তির উৎস ছিল তাঁর শ্রীকৃষ্ণে নির্ভরতা। ঠিক একইভাবে পাশ্চাত্যের ভোগবাদ, তাদের ঐশ্বর্য, তাদের যুক্তি, বুদ্ধি, বিজ্ঞানের সম্মিলিত বিরোচন-শক্তির সম্মুখে স্বামীজী একা, কিন্তু তাঁর শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনি লিখছেন ব্রহ্মানন্দজীকে ওই চিঠিতেই—''তিনি যে রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মতো মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না তিনি রক্ষা করছেন?"

স্বামীজী প্রায়ই চিঠিতে লিখতেন, 'মদ্‌ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'—আমার ভক্তের যে ভক্ত সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। স্বামীজীর সমগ্র জীবনে এর অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ। তাঁর উপলব্ধিতে ছিল শাস্ত্রের উক্তি—'সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে' কিন্তু একটা সঙ্ঘ ধরে রাখতে যে-পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস দরকার তা কি এই দাস মনোবৃত্তিসম্পন্ন, পরশ্রীকাতর সমাজ দিতে পারবে? একটাই পথ, সেটি হল সঙ্ঘগুরুর প্রতি আনুগত্য ও নিঃশর্ত ভালবাসা এবং সেই ভালবাসার সূত্রেই পারস্পরিক ভালবাসা ও সহযোগিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভারটি অর্পণ করেছিলেন তাঁর আদরের নরেনের ওপর। সেটি বহনের প্রারম্ভেই নরেন্দ্রনাথ বাবু প্রমদাদাস মিত্রকে চিঠিতে লিখছেন, (২৬।৫।৯০) ''আমার উপর তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণ) নির্দেশ এই যে, এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক লইতে রাজী আছি।" ব্রহ্মানন্দজীকে আমেরিকা থেকে লিখছেন (৪।১০।৯৫), ''যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে।... আমি তোমাদের গোলাম, যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম...।" শুধু বলছেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত হরমোহনকে টাকা পাঠাচ্ছেন তার বিপদে; ভাইদের ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখছেন, (নং ১৪৩।১৮৯৪) ''দমদম মাস্টার কেমন আছে? দাশুর তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কিনা? সে ঘন ঘন আসে কিনা? ভবনাথ কেমন আছে, কি করছে? তোমরা তার কাছে যাও কি না?" (১০।৮।৯৭) যে-উন্মুক্ত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে আপন করেছিলেন, সেই উন্মুক্ত দৃষ্টি ও হৃদয় স্বামীজী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন এবং সেটি ভাইদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।

গীতা মূলত ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশক কোনও

বিশেষ রূপ, আচার বা সাধনপথকে বড় করে দেখাননি। যেহেতু ঈশ্বরবিষয়ে বিভিন্ন শ্লোকে উত্তমপুরুষের প্রয়োগ আছে অতএব অনেক ব্যাখ্যাকার সমস্ত মত, পথ, পূজা-অর্চনার গতি একমাত্র বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ এইরকম ধারণা প্রচার করে থাকেন। কিন্তু গীতার মর্মজ্ঞ সিদ্ধপুরুষগণ এই প্রয়োগের মাধ্যমে উপদেষ্টার ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি ও নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরতত্ত্বের প্রকাশ ঘটতে দেখেন। স্বামীজী পাশ্চাত্যে বেদান্ত বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-এর ভিত্তিতে ধর্মের সারতত্ত্ব প্রচার করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না করে। এতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে প্রথমে ক্ষোভের গুঞ্জন পরে সোচ্চার প্রতিবাদও উঠেছিল। কিন্তু স্বামীজী জানতেন ভাবটি গৃহীত হলে তার উৎসটিকে মানুষ খুঁজে নেবে অচিরেই তার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী; জোর করে তা চাপিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। কারণ প্রথমেই অবতারপুরুষকে সামনে নিয়ে এলে তিনি বহু মানুষের পূজা পান ঠিকই, কিন্তু তাঁর ভাবগুলি ক্রমশ গৌণ হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে যায়।

ঠিক এই কারণেই তাঁর আপত্তির কারণ ছিল 'শশীর ঐ ঘণ্টানাড়া আর ঠাকুরঘর'। এ-বিষয়ে শিবানন্দজীকে লিখছেন, ''ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই; তবে তিনি কি বলতেন, লোককে দেখতে দাও; তুমি জোর করে কি দেখাতে পারো?... তাঁর এক একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়।... তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। তাঁর নাম বরং ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ (শিক্ষা) ফলবতী হোক। তিনি কি নামের দাস?''

''যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।/
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥''
(২।৫৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন কচ্ছপ একবার হাত-পা ঢুকিয়ে নিলে কেটে ফেললেও আর বার করে না। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে যিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত করেন তিনিই প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত। এ-বিষয়ে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠার এক চমকপ্রদ উদাহরণ। তিনি তখন ডেট্রয়েটে, বক্তৃতায় বলেছিলেন, যিনি সত্যলাভ করেছেন তাঁকে আর বাইরের কোনও বস্তুই বিচলিত করতে পারে না। শ্রোতাদের মধ্যে উগ্রপ্রকৃতির কাউবয়রাও ছিল। তারা এটি শুনে স্বামীজীকে তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে একটি গোরুর ডাবাকে উলটো করে তার ওপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা করতে বলল। তিনি শুরু করলেন এবং অনতিপরেই কাউবয়রা তাঁর কানের পাশ দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। কিন্তু স্বামীজী অবিচলিতভাবে তাঁর বক্তব্যে মগ্ন রইলেন। তারা অবাক, এরকম মানুষ তারা কল্পনাতেও আনতে পারেনি।

''ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।'' মালার মধ্যে সুতোর মতন ঈশ্বর সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুস্যূত। স্বামীজীর এ-অনুভূত সত্য সঞ্চারিত হয়েছিল শ্রোতাদের মনে, যখন ধর্মমহাসভায় তিনি বলেন, ''সমস্ত ধর্মই সত্য কারণ মানুষ ঈশ্বরের যে-নামই দিক না কেন, তা সেই একই ঈশ্বর যিনি সব ধর্মের মধ্যেই অনুস্যূত।'' বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদের প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধা এবং সকল ধর্মের উচ্চতম ভাব ও সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রকাশ সকল ধর্মের মানুষকেই মুগ্ধ করে রাখত—যার অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ''যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।/তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥'' এ-জগতে যা-কিছু সুন্দর, বলশালী ও তেজঃপূর্ণ তা আমারই বিভূতি। এই অর্থটি আত্মস্থ করার চেষ্টা করলে তিনটি বিষয়ে স্থিতিলাভ হয়। প্রথমটি অহংকারহীনতা, দ্বিতীয়টি সাম্য ও তৃতীয় সমন্বয়। স্বামীজী তাঁর

নিজের জ্ঞান ও গুণপনা সম্বন্ধে জানতেন ওসব শ্রীরামকৃষ্ণেরই শক্তি, তাই ও-বিষয়ে অহংকারের লেশমাত্রও রাখেননি। তিনি যখন অজ্ঞাতপরিচয় সন্ন্যাসী থেকে রাতারাতি বিখ্যাত, শিকাগোর মানুষেরা তাঁকে দেখতে, স্পর্শ করতে পাগল, রাস্তায় জননিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ দরকার হয়, সেইসময় তিনি শ্রীযুক্ত লায়নের গৃহে ফিরতেন বক্তৃতায় সংগৃহীত অর্থ নিয়ে এবং লায়নের নাতনির স্মৃতিলিপি অনুসারে : ''তাঁহার কোনও টাকার থলি ছিল না, তাই তিনি রুমালে বাঁধিয়া ঐসব লইয়া আসিতেন—যেন সাফল্যগর্বিত একটি বালক! ঘরে আসিয়া উহা দিদিমার কোলে ঢালিয়া দিতেন তাহার হিসাব রাখিয়া দিবার জন্য। দিদিমা তাঁহাকে বিভিন্ন মুদ্রার পরিচয় করাইয়া দিতেন।''

নাম-যশ-প্রতিভাকে কখনও নিজের মনে করেননি বলেই অবলীলায় এভাবে অতি সাধারণ স্তরে নেমে লোকব্যবহার করতে পারতেন স্বামীজী। আর একটি ঘটনা। হেল পরিবারের বাড়ির কাছে 'লিঙ্কনস্ পার্ক'-এ সকালে বেড়াতে যেতেন। এক মহিলা বাজার করতে যাওয়ার সময় পার্কে তাঁর শিশুকন্যাকে স্বামীজীর কাছে রেখে যেতেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। তিনি স্বামীজীর খ্যাতি জানতেন না, আর স্বামীজীও এ-ব্যাপারে ছিলেন নিরুত্তাপ। সেই মেয়েটি বড় হয়ে জানতে পারে কার কাছে সে ছেলেবেলায় গল্প শুনে কাটিয়েছে। সেই অলৌকিক সঙ্গের ফল তাকে পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ''—নিত্য আত্মার ধারণ-করা এই দেহগুলি বিনাশশীল, তাই আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে তুমি যুদ্ধ করো। সমগ্র জগতের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই অলৌকিক যুদ্ধে স্বামীজীর আত্মভাবে স্থিতি প্রায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতন স্বাভাবিক ছিল। এর এক অতি সুন্দর বর্ণনা আছে মিস ওয়ালডোর স্মৃতিলিপিতে। তিনি স্বামীজীর সেবিকা, পাচিকা, শ্রুতিলিপিবিদ, সহকারিণী। একাধারে অনেক বিষয় সামলাতেন। কিন্তু অন্য অনেক দিক্‌পাল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর সর্বদা দুশ্চিন্তা, পাছে তাঁদের মতন স্বামীজীরও তুচ্ছ চারিত্রিক দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ে। তিনি না চাইলেও তাঁর মন তন্নতন্ন করে স্বামীজীর ব্যবহারে দুর্বলতার চিহ্ন খুঁজে বেড়াত। একদিন দেখলেন স্বামীজী বৈঠকখানা ঘরে পায়চারি করছেন আর প্রতিবার বড় আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছেন নিজেকে দেখতে। তিনি ভাবলেন, এ কী! স্বামীজী এত বড়মাপের মানুষ অথচ তাঁর রূপের গরিমা, অহংকার তাঁকে বারবার আয়নার সামনে দাঁড় করাচ্ছে! ওয়ালডোকে সামনে দেখে স্বামীজী উৎকণ্ঠিত ও বিপন্নমুখে বললেন—''দেখো আমি বারবার আয়না দেখে আমার চেহারা মনে রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু আয়না থেকে সরে গেলেই ভুলে যাচ্ছি, কী মুশকিল বলো তো?'' মিস ওয়ালডো প্রথমে অবাক, তারপর গর্বিত ও সমৃদ্ধ মনে করলেন নিজেকে—এরকম অশ্রুতপূর্ব এক ঘটনার সাক্ষী হতে পেরে।

এইরকম একটা অবস্থায় সদা অবস্থান ছিল বলেই ধর্মের মূল সত্যকে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের মতন ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছিলেন স্বামীজী এবং তা আজও তাঁর হাতে ধরা আছে। সে-আচ্ছাদনটি শুধু জগতের সত্যান্বেষী মানুষদের জন্যই নয়, সংসারক্লিষ্ট মুক্তিকামী মানুষদেরও নিশ্চিত আশ্রয়রূপে বিরাজ করছে। ✠